

বালিশিখা



মহান একুশে সংখ্যা ১৩৯৪

খুলনা লেখিকা সংঘ

জামগ্রিক পরিচালনায়

(১৯৮১)

- ১। বেগম মাজেদা আলী — সভানেত্রী
- ২। নূরুন্নাহার হাসান — সহ-সভানেত্রী
- ৩। খালেদা আহমেদ বীণা — ”
- ৪। পুরাইয়া হামিদ শিরিন — ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা
- ৫। পারভীন সুলতানা — মুদ্রণ সম্পাদিকা
- ৬। আসমা সরোয়ার — কোষাধ্যক্ষা
- ৭। মমতাজ বেগম বিজলী — সদস্যা
- ৮। জাহানারা বেগম লিলি — ”
- ৯। এস. এ. ওয়াহিদা ইসলাম — ”
- ১০। সায়েরা রহমান — ”
- ১১। তৈয়বা ফিরোজ — ”

আজীবন সদস্যা : মাজেদা আলী, মাজেদা রহমান, খালেদা আহমেদ বীণা, আসমা, সরোয়ার, তৈয়বা ফিরোজ।

আরও রয়েছেন : জাহেদা রহমান, মলয়া ভট্টাচার্য, সখিনা রহমান, শাহনেওয়াজ বেগম, শামীমা সুলতানা শীলু, মাহমুদা বেগম, সাহানা হাসান ডলি, মমতাজ বেগম মুক্তা, সোনীয়া হাদী, সুফিয়া রহমান, সাদেকা নাসির, মেরিনা কুদ্দুস, নূরজাহান বেগম শেলী, মেহেরুননেছা, প্রতুল হায়দার, আজ্জমান আরা, ফিরোজা আনাম, মিনু মমতাজ, নাসরিগ বানু, মনুয়ারা মহসিন।

শুভেচ্ছা

হাটলবহী কল্যাণ

প্রতি বছরের মতো আবাও ফিরে এসেছে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত প্রিয় মাস ফেব্রুয়ারী। মাতৃভাষার সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য বায়ান্ন সালের এই দিনে ঢাকার রাজপথে যে প্রতিবাদ উঠেছিল, সে প্রতিবাদ আজও অহমান। এক তরুর মস্তিষ্ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যদয় ভাষা আন্দোলনেরই চূড়ান্ত পরিণতি। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালী জাতি ছাড়া আর কোন জাতির ইতিহাসে নেই। এই দিনটি প্রতিবছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য নিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে আসে।

এই উপলক্ষে খুলনা লেখিকা সংঘ 'বহিঃস্থি' স্মরণিকা করছে জেনে আমি আনন্দিত। এই স্মরণিকা প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমি খুলনা লেখিকা সংঘের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

৩/২/৮৮

আনিসা চৌধুরী

পৃষ্ঠপোষক

খুলনা লেখিকা সংঘ।

পরিচিতি

দ্বিতীয়

- ১। মাহবুব আলম চৌধুরী— কাঁদতে আসিনি ফাঁসির
(সংগৃহীত : মমতাজ বেগম বিজলী) দাবী নিয়ে এসেছি ১
- ২। মনুয়ারা মহসিন—একুশের দিনে ২
- ৩। খালেদা আহমেদ বীণা—নাটক ৩
- ৪। শামুমা সুলতানা শীলু—স্মৃতির গভীরে ৪
- ৫। মিনু মমতাজ—গোলাপের বর্ণমালা ৫
- ৬। রিনা নাসরিণ—সামগ্রিক ৬
- ৭। সখিনা রহমান—এসো ফাল্গুন এসো ৮
- ৮। নূর জাহান বেগম শেলী—এলো ফাল্গুন ৯
- ৯। বেগম মাজেদা আলী—ফাল্গুনের সূর্যালোকে ১০
- ১০। সুরাইয়া হামিদ শিরিন—হৃদয়ের রক্তিম আঁতি ১১
- ১১। তৈয়্যবা ফিরোজ—একুশের গান ১৬
- ১২। ওয়াহিদা ইসলাম—একুশ বাঙ্গালীর চেতনার প্রতীক ১৮
- ১৩। মল্লিকা ভট্টাচার্য—অর্থবহ স্বাধীনতা ও আমরা ২০

সম্পাদকীয়

জীবনী

বাঙ্গালীর ভাষা আন্দোলন সাড়ে তিন দশক পূর্বের এক জাগরণ। ভাষার সে আন্দোলন স্বাধিকায় ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারায় যুক্ত হয়ে এ ভাষার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। আপন অস্তিত্ব তুলে ধরেছে বিশ্বের বুকে।

বাঙ্গালীর ভাষা আন্দোলনের সৈনিকেরা একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুভূতি-প্রবণ দৃষ্টির সামনে জাতি অগ্রসর হচ্ছে। নতুন সমকালীনতাকে প্রবল তাগিদে তুলে ধরে পরিবর্তনের আওয়াজ তুলেছে। সমকালের উল্লাপকে লালন করে এবারের একুশে ফেব্রুয়ারী নতুন ভাষাপ্রবাহী হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে!

বাঙ্গালীর ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদানের রক্তে লিখিত হয়েছে এ জাতির স্বকীয়তাপূর্ণ অনন্ত বিকাশের লক্ষ্য। সে পবিত্র রক্তের স্বপ্ন পরিণোধ করার জন্য এ জাতিকে আরও বৃহত্তর ত্যাগ স্বীকারে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। একুশের এ আন্দোলন জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আমাদের নব জাগরণের আন্দোলন। একুশ এ সবে বিকাশ ধারার পটভূমি। একুশ এ জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিশা। একুশের আনুষ্ঠানিকতা তাই কেবল স্মৃতিচারণের পৌনপুনিকতাই নয়, একুশে আমাদের জাতীয় চেতনার উৎস মুখ লগ্নে থাকুক আমাদের বহিঃশিখার পাতায়।

বেগম মাজেদা আলী

পহেলা ফাল্গুন '৯৪

কাঁদতে আজিনি ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি

মাহবুব আলম চৌধুরী (চট্টগ্রাম)

চল্লিশের দ্বাদশ

এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রসনার উর্দ্ধমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়
যেখানে অগ্নির ফুলকীর মতো এখনো জ্বলছে
এখানে ওখানে, অসংখ্য রক্তের ছোপ,
সেখানে আমি কানতে আসিনি।

আজ আমি শোকে বিহবল নই,
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই,
আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল,
রক্তের গৌরবে অভিষিক্ত।

যে শিশু আর কোনদিন তার পিতার কোলে
বাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে না,
যে গৃহবধু আর কোনদিন তার স্বামীর প্রতীক্ষায়
আঁচলে প্রদীপ তেকে দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকবে না,
যে জননী খোকা এসেছে বলে উদ্দাম আনন্দে
সন্তানকে আর বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে না,
যে তরুণ মাটির কোলে লুটিয়ে পড়ার আগে
বারবার প্রিয়তমার ছবি চোখে আনতে চেষ্টা করেছিলো ;

সেই অসংখ্য ভাই-বোনদের নামে
আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত,
যে ভাষায় আমি মা'কে সম্বোধনে অভিষিক্ত,
সে ভাষা ও স্বদেশের নামে ;

এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
আমি তাদের ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি
যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে নিবিচারে হত্যা করেছে।

(সংগৃহীত : মমতাজ বেগম বিজলী)

একুশের দিনে

মনুয়ারা মহসিন

(মোহিত) চিত্রিত) সত্যজিৎ রায়

রক্ত দেখলে এখনও শিহরণ জাগে—

সে এক অনন্য শিহরণ।

মন ছুটে যায় রক্তাভ ফুলের বনে বনে

আকাংখার খেত কপোতরা উড়ে যায়, যায়

একান্ত প্রবাসে।

ইংরেজী অক্ষর সাজিয়ে ওকে লিখতে হবে

হঠাৎ মনে পড়ে—

একটি চিঠির কথা

গুটা ভুলিনি।

“আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

ভেসে আসে দূর হতে ইথারে ইথারে

বেরিয়ে আসে একরাশ বেদনা—

স্মৃতির গহন থেকে।

শেষ রাতের শুকতারাটা কখন গেছে ডুবে

এখনি শুরু হবে শহীদ বেদীতে—

মুঠো মুঠো ফুল সাজানোর পালা ;

ফাল্গুনের কৃষ্ণচূড়ায় একুশের উৎসব।

আরও একবার মনে পড়বে বাংলায় লেখা—

সেই বিশেষ পত্রটির কথা।

ধরা পড়ে যাই নিজের কাছে বিবেকের লুকোচুরি।

ফুলের পাপড়িগুলো বাতাসে উড়ে যায়, যায়

ছেড়া টুকরো কাগজের মতো।

আজো শুনি শহীদের আত্মাহুতির গান।

তারপর, তারপর, ... তারপর

সবকিছু দূরে যায়, যায়

শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা

একুশের দিনে।

নাটক

খালেদা আহম্মদ বীণা

চ্যাপ্টা চতুর্থ

(চলি) চোততর আটতাল

"জনতা

সকাল

৮ই ফাগুন

১৩৫৯ সাল

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।"

না, খেয়ালী মানুষের অনর্থক উক্তি নয়।

একটি নাটক,

ওগুলো একটি পাণ্ডলিপি বিহীন নাটকের অংশ।

আমরা সবাই ছিলাম এক একটি চরিত্র এ নাটকের।

এখানে একটি মাত্র সংলাপ উচ্চারিত প্রতি কণ্ঠে—

রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

হঠাৎ পর্দার অন্তরালে

কন্ঠের আওয়াজ ছাপিয়ে বেজে উঠল ঠা ঠা আওয়াজ।

সাথে সাথে গুলে পড়লো কয়েকটি চরিত্র।

মঞ্চে তখন একটি ছাড়া আর নেই অন্য কোন রঙের ছোপ।

একটি মাত্র একটি রঙের ব্যবহার "লাল—লাল—লাল"।

রক্তের নয়, সে লাল আমাদের সবার হৃদয়ের রঙ।

নাটক শেষে

ফিরে এলাম আমরা সবাই।

ফিরলাম মায়ে মুখের ভাষা কণ্ঠে তুলে বিজয়ীর বেশে

ফিরলোনা শুধু—

সালাম—বরকত—শফিক—জব্বার।

(৪)

(৩)

স্মৃতির গভীরে

শামীমা সুলতানা (শীলু)

কবিতা

প্রতি বছর একশে ফেব্রুয়ারী

প্রতি বছর একশে ফেব্রুয়ারী,—

যেন স্মৃতির গভীরে—

খানিকটা ছেলে খেলা।

স্বর-ব্যাঞ্জন বর্ণের হত্যার প্রতিবাদ,—

বাগ্মীর রক্ত শপথ,

আজ ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতি।

মিছিল-শ্লোগান-বক্তৃতার বাড়ি ;

কাচানো পাঞ্জাবী আর—

সাদা শাড়ীর ভাঁজে উৎসবের ঝিলিক।

প্রতি বছরে একশে ফেব্রুয়ারী,—

যেন স্মৃতির গভীরে—

খানিকটা ছেলে খেলা।

রফিকের স্মৃতি চতুর ডালিয়ার গুচ্ছ,

সালাম-বরকতের মাজারে তাজা ফুলের স্তূপ।

‘বাংলা একাডেমী’ আর সাহিত্য মঞ্চে—

মুখরিত বক্তার ঝলসানো বক্তৃতা।

প্রতি বছরে একশে ফেব্রুয়ারী,—

যেন স্মৃতির গভীরে ফেলে আশা—

এক তপ্ত রৌদ্রচ্ছটা ॥

গোলাপে বর্ণমালা

মিনু মম্বতাজ

একুশ তুমি নেমে এসো
দেয়াল থেকে নিরন্ন মানুষের পাশে
একুশ তুমি স্মরণ করো
ফেলে আসা ইতিহাস
যেখানে তুমি অক্ষয় খোদিত
একুশ তুমি হয়োনা সংকীর্ণ
কেড়ে না বাংলার সম্মান
থেক না উৎসবে
ফ্রেমে আটা ছবি হয়ে
গুধু গোলাপের মাঝে—হয়ো না লীন,
প্রাণের তারে হও বিলীন
প্রশ্ন জাগে মনে
তুমি আজ বিষন্ন কেন ?
কেন তুমি ক্লান্ত ?
স্মৃতি হয়ে থাকো মিনারে মিনারে
একটি দিন ছাড়া
যে কীদে অবহেলায়
দিন কাটায় নিশ্চুপ অতন্দ্র প্রহরী হয়ে
কেন জাগে সে একদিন ?
কেন কথা কয় একটি সময়ে
জনতার সাথে ?
কেন আসে অতিথির মত
এই বাংলায় ?
একুশ তুমি অতিথি নও
নও অপর জন
তুমি রবে হৃদয়ে হৃদয়ে
বাংলার ঘাসে ঘাসে
প্রতিদিন রবে কৃষকের মাঠে
জনতার সাথে—মিছিলে মশালে
একুশ তুমি একুশেতে নয়
এসো “নিত্য দিনে”
‘প্রতিদিন’ হয়ে হাসো নিরন্ন জীবনে ।

সামগ্রিক

রিষা নাসরিন

আমার দেশের জন্যে কিছু করতে পারিনা
আমার পরিস্থিতি নেই,
আমার মনের ক্ষমতা আছে
বাহ্যিকতা নেই আদৌ।
যখন দেখি স্বাধীনতার ফুল ফোটাতে
অকাতরে প্রাণ নাশের ছবি
কোন দুঃখ আমাকে ছুঁতে পারেনা
অজান্তে চোয়াল দুটো শক্ত হয়
লোমকূপে শক্তি জমে
ইচ্ছে করে —
হৃদয়ের সব চাইতে আপন তন্ত্রীটা বাজিয়ে
একটি ক্ষুদ্র গান গাই—
যাতে থাকবেনা কোন অকৃত্রিম স্বরলিপি
যুদ্ধে কোন স্বজন মরেনি আমার
যেখানে কণ্ঠটা প্রখরতা পাবে
তবু রূপাতিক্রম দেখি—
যখন দেখি জয়নুলের তুলিতে
মড়ার উপর সুধু শব্দ
তীব্র শব্দ গ্রাহকের রেকর্ডে
গুলির শব্দ অব্যোরে
টি, ভির পর্দায় শহীদ স্মরণে
সকরান সুর
মিছিলের সারিতে বলিষ্ঠ বাহ
আমার চেতন হারা হই
খাজু হুগ্ন স্নায়ু
মনবলে উন্নত শত্রুর শক্তি
ছিড়ে খুঁড়ে খাই।
স্বাধীনতা আমাদের ফুলদিল
গন্ধ দিল না—

স্বাধীনতা আমাদের সমাজ দিল
 ব্যবস্থা দিল না ।
 ভালবেসে দোষ করেছিল সীমা
 দোষ করেছিল গোয়ালার ছেলে
 হারু লেখপড়া শিখে যুদ্ধে যেয়ে
 পা দু'টো হারিয়ে
 হইল চেয়ারের চাকার সাথে ঘুরছে অনিশ্চিত জীবন
 দোষ করেছিল হাসনাহেনার জীবনে
 বসন্তের ফুলফুটে
 জোর করে ছিড়ে নিল
 ক্ষরণ বইল বীরাজনার
 নারীত্ব হারিয়ে জ্বলাদী জীবন তার ।
 স্বাধীনতা কি দিল সীমাদের
 বিজয় দিবস কি দিল হাসনাহেনাদের
 একুশে কি দিল শহীদদের !

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

চাওঁরুই ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

১৯৭০ চন্দ্রক ১৯৭০

এসো ফাল্গুন এসো

সখিনা রহমান

এসো ফাল্গুন এসো
অতীতের স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে
এসো ফাল্গুন এসো ।
গাছে গাছে পুরানো পাতা ঝরিয়ে
নতুন পাতা গজিয়ে দিতে এসো ।
বিকশিত কাঞ্চন ফুলের সুবাস ছড়িয়ে
ডালে ডালে পুঞ্জিত হবে আশ্রয় মুকুলে,
কুফচুড়া, পলাশ, শিমুলের ডগায়
জ্বলবে রক্তিম আলো ।
তোমার মাঝে এসেছিল সেই প্রথম
শোকের দিবস, একুশ—মহান একুশ,
যে একুশ বাঙ্গালীর জীবনে এক
স্মরণীয় স্মৃতি ।
তারপর,—স্বাধীনতার দহনে
শোকে ঘ্রিয়মান ;
কত মা—ভাই-বোনের শোকাতুরা
স্মৃতি বিজড়িত অন্তর ।

ক্যাম্বোজ চ্যাপ্টার

বিভাগ (১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) (১৬) (১৭) (১৮) (১৯) (২০) (২১) (২২) (২৩) (২৪) (২৫) (২৬) (২৭) (২৮) (২৯) (৩০) (৩১) (৩২) (৩৩) (৩৪) (৩৫) (৩৬) (৩৭) (৩৮) (৩৯) (৪০) (৪১) (৪২) (৪৩) (৪৪) (৪৫) (৪৬) (৪৭) (৪৮) (৪৯) (৫০) (৫১) (৫২) (৫৩) (৫৪) (৫৫) (৫৬) (৫৭) (৫৮) (৫৯) (৬০) (৬১) (৬২) (৬৩) (৬৪) (৬৫) (৬৬) (৬৭) (৬৮) (৬৯) (৭০) (৭১) (৭২) (৭৩) (৭৪) (৭৫) (৭৬) (৭৭) (৭৮) (৭৯) (৮০) (৮১) (৮২) (৮৩) (৮৪) (৮৫) (৮৬) (৮৭) (৮৮) (৮৯) (৯০) (৯১) (৯২) (৯৩) (৯৪) (৯৫) (৯৬) (৯৭) (৯৮) (৯৯) (১০০)

এলো ফান্তন
বুরজাহন বেগম শেলী

বসন্তের রঙিন পাতায়
প্রাণের পরশ জাগে—
গানের মাধুরিমা হাসি
দূরের রাগিনী বাজে
মোহিনীর বাঁশী ॥
আম্র মুকুল বারে
কুঞ্জ কাননে—
বহে দক্ষিণা বাতাস
সৌরভ সঞ্চরণে—
পলাশ-শিমুল ফোটে বনে
মোমাছি গুঞ্জরণে—
বকুল মুকুল শাখে
মাধবী লতা ঐ দোলে
প্রজাপতি ডানা মেলে ॥
বিরহী হৃদয় কাঁদে
কোয়েলিয়া কুলুতানে—
আকাশে-সফাতারা
জেগে আছে আনগনে ॥

ফাল্গুনের সূর্যালোকে

বেগম মাজেদা আলী

আটান্ন থেকে চুরানব্বই একে একে
ক্রমান্বয়ে গড়িয়ে গেল সাড়ে তিন দশক ।
আটান্নর সেই এক ফাল্গুনের বাসন্তী ভোরে
দুবার চঞ্চল জনতার অবহেতন ভেঙ্গে
সেদিন ছুটেছিল জনতা দুরন্ত প্রবাহে
ভাষার দাবীতে রাজধানীর রাজপথে,
উদ্ভাসিত হয়েছিল আপন জাতীয় সত্তা
রক্তিম সূর্যালোকে ।
সাতকোটি বাঙ্গালী সেদিন প্রাণের উষ্ণতা নিয়ে
ভাষার গানের সংলাপ গেয়েছিল সোচ্চারে ।
শ্রী হয়েছিল স্বামী হারা, মা তার সন্তান,
বুলেটের আঘাতে রঞ্জিত হয়েছিল সেদিন
রাজপথ থেকে হৃদয় ।
বীরত্বের বিপুল গৌরবে কেটে গেল দুটি দশক
নতুন জীবন লভি
আশার স্বপনে জাগলো জাতীয়তা বোধের
নব চেতনার সুরভি ।
রক্ত পলাশেরা রঙ তুফানের মাঝে
ত্যাগের মহিমা শেখালো,
জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞায় মানুষ জীবনের পথ
চলার ইঙ্গিত পেলো ।
তারপর :—আটাই ফাল্গুনের সিঁড়ি বেয়ে
এলো স্বাধিকার অকুনোদয়ের অগ্নি সাক্ষী হ'ল
এলো স্বাধীনতা সোনালী স্বপনে ভরা প্রাণে প্রাণে
বাঙ্গালীর স্বপনে-জীবনে ।
সবুজের অসীম জোয়ার এলো ধূসর জীবনে
ত্যাগের গৌরব নিয়ে ।
আনন্দে মুখর হোল আশার স্বপন
দশকোটি সচেতন জাগ্রত জনতা এখন ।
তবুও একুশের চিন্তা কৈশোর-যৌবন পেরিয়ে
বাক্কো এগিয়ে গেল ; কিন্তু ভাষাতো আজও
বন্দী রইলো কত শত হৃদয়ের আকুলতা হয়ে ॥

হৃদয়ের রক্তিম আঁতি

সুরাইয়া হামিদ শিরিব

একটু একটু করে অন্ধকার ক্রমশ ঘনিয়ে এলো। শীতের পঙ্কজ বিকেল। সন্ধ্যার নিবিড় নীরবতা চারিদিক ছেয়ে আছে। বরাবর পথটার দিকে তাকায় শাহেদ কুমু এখনো আসছেন কিনা দেবীতো হবার কথা নয়। ওর অফিসতো সেই পাঁচটায় ছুটী হয়েছে। প্রতিদিন এর চাইতে অন্ততঃ ঘন্টাখানেক আগেতো আসে এদিকে মেয়েটা স্বয়ং কাত-রাচ্ছে। শুধু মাকে কাছে চাচ্ছে।

পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় শাহেদ তন্ময় হয়ে অতীতের ঝুলিটার দিকে চোখ বাড়ায় :— মানুষের জীবনটা শুধু মাত্র কয়েকটা ঘটনার ইতি বৃত্তি এই তো সেদিনও বাবার সাথে বের হলে লোকে আঙ্গুল উচিয়ে বলতো। জামাল মাষ্টারের ছেলে, ঠিক বাপের মতো হবে। জামাল মাষ্টার গ্রামের স্কুলটাকে নিজের যত্নে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন বড় ছেলে রফিক এইতো পাশদিয়ে এলো বলে। তাকায় ভাসিটিতে পড়ে। ছুটী ছাটায় বাপের সাথে স্কুল দেখে। ও ছেলে এলে গ্রামে আর পাড়ার কণ্ঠ হবেনা।

কিন্তু রফিক কি এসেছিলো স্কুল গড়তে? এসেছিলো গ্রামের মানুষের মাঝে। তার আগেই এসেছিল বাহান্নো সাল। ভাষা আন্দোলন। মায়ের ভাষায় কথা বলা চলবেনা। সব বাঙ্গালীর মুখ বন্ধ করে দিতে হবে, সব কাফেরের বাচ্চা। ধর্ম বলতে জান নেই—উদ্‌ হবে রাষ্ট্রভাষা

ফুসে উঠলো ছাত্র জনতা। জান দেবো তবু মায়ের ভাষার
অপমান সইবো না। একশোচুয়াল্লিশ ধারা, মিছিল, ব্যারিকেড
হত্যা সব মিলিয়ে একটা তাণ্ডব বর্ষরতা চলেছিলো ঢাকার রাজপথে
সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারীতে। অনেক লাসের সারিতে রফিকের লাশ ও
সেদিন পড়েছিলো মেডিকেলের চত্বরে।

কি-ই-বা বয়স তখন সাহেদের। মায়ের মুখে শুনেছে সাহেদের
বাবা এবং ভগ্নিপতি শহরে গিয়েছিলো বাজার করতে। সামনে মাসে
রফিকের বিয়ের দিন তারিখ সব কিছুই ঠিক। সারাদিনে রফিকের
বাবা তার দেখা না পেয়ে মেয়ের বাড়ী ফকিরাপুলে বিশ্রামনিচ্ছিলেন
বাবার বাজার ঠিকই করা হয়েছিল কিন্তু রফিকের বিয়ে আর হয়নি।
ঘটনার পরদিন লোক মুখে সংবাদ পেয়ে ছুটে গিয়েছিলেন মেডিকেলের
চত্বরে। অনেকের মাঝ থেকে বিকৃত ঝলসানো রফিকের লাশ সনাত্ত
করেছিলেন জামাল মাষ্টার। সময়ের চাবুকের দগদগে ঘা এক সময়
ভুলিয়ে দিয়েছে রফিকের অনেক স্মৃতিকে সংসারের আর পাঁচ জনের
মতো। তিনিও স্ত্রী সন্তানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। রফিক আজ
শুধু তারই সন্তান নয়, সে বাংলা মায়ের সন্তান। সে ভাষাকে মায়ের মূল্য
দিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। একজন সহজ সরল গ্রাম্য স্কুল মাষ্টারের
এর চাইতে কি বা চাওয়ার থাকতে পারে?

হ্যা মনে পড়ে সাহেদের বাবাকে কতো দিন কতো সময় দেখেছে
সহীদ মিনারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চোখ মুছতে। মাকে দেখেছে
লুকিয়ে কাঁদতে আঁছে চোখ মুছতে। কিন্তু কেনো কি এতো দুঃখ
যার জন্য এতো কাঁদা—ভাইয়া? সেতো বড় একটা পাশ দিতেগিয়েছে
ঢাকা। সাত বছরের সাহেদ বড় হতে হতে জেনেছে কেন বাবা কাঁদেন

মা কঁদেন। বড় হয়ে ভাইয়ার জন্য শাহেদ ও কঁদেছে। কঁদার চেয়ে ভাইয়ার জন্য গববোধ করেছে বেশী। ফেকুয়ারী এলে মনে হয়েছে ভাইয়ারা বুঝি ঐ দলবেঁধে সবাই আসছে। কিন্তু না একুশ গেলে আর কারো মনে হয়নি কেন একুশ এসেছিল।

দিনের কাখে ভর করে মাস আসে এক সময় বছর গড়ায় এমনি করে শাহেদ স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ঢোকা। সেবার ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়ে কোন ক্ষণে যে শাহেদ স্কুলে বাবার চেয়ারটায় বসলো তা আজ আর মনে নেই। জামাল মাষ্টারের ছেলে শাহেদ মাষ্টার ঠিক যেনো বাপের ধাপেই মানুষ হয়েছে। এর পরে বেশ আরো কিছুটা দিন মাস পেরিয়ে ওর জীবনে এসেছে কুমু। বাবার পছন্দ করা বৌ। কুমু এসে মা বাবাকে যেনো ঝিম দেয়া থেকে চাঙ্গা করে তুলেছে। সব কিছুতে যত্ন সব কিছুতে ওর খবরদারি বাবা মা তাতেই খুশিতে অস্থির। সুখ নামে সুখ পাখীটা ওদের ছোট্ট সংসারে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। তাই ভালবাসায় টই টুইর ছিল ওদের দাম্পত্য জীবন।

হঠাৎ করেই যেনো একাত্তর এলো তার সর্বনাশা রূপ নিয়ে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিলো শহীদ মিনার, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একাকার করলো সোনার বাংলাকে। হত্যা লুট ধর্ষণ অত্যাচার অবিচার হিটলারকেও হার মানিয়েছিল পাক সেনারা। ঘরে ঘরে ঢুকে হত্যা তাদের রক্তে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। এ হত্যারসেও শিকার হয়েছিল। সকাল দশটা সেদিন সূর্য্য বোধ করি নিষ্ঠুরতা নিয়ে উঠেছিল পশ্চিম আকাশে। গ্রামের চেয়ারম্যান রমিজ চাচার সঙ্গে খানসেনারা ঢুকেছিল শাহেদদের ঘরে। উদ্ভূতে নিজেরা কি আলাপ করলো রমিজ চেয়ারম্যান মাথা নাড়লেন। অমনি বাবার মাথায় একজন বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করায় বাবা পড়ে গিয়েছিল, শাহেদের সহ্য

হয়নি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল বাবাকে কার বুটের এক লাথিতে ছিটকে পড়েছিল শাহেদ তারপর ওরা বাবা-মাকে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে মেরেছে। হ্যা শাহেদের বুকে তখনো বেয়নেট চেপে ধরা ছিল; রফিকের বাবা-মা হবার সাধ চির জনমের জন্য শেষ করে ওরা শাহেদ ও আরও কয়েকজন যুবককে ধরে নিয়ে আসে নদীর ঘাটে।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন ঘটনার ২/৩ দিন আগে কুমু দূর গ্রামে গিয়েছিল ওর মাকে দেখতে, তাই বেঁচে গেছে। নদীর ঘাটে দাড় করিয়ে ওরা গুলি করেছিল, শাহেদ ব্যাপিয়ে পড়েছিল নদীর বুকে, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ওর ডান পাটায় গুলি লেগে পচন ধরেছিল ওটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। সেই যে নদীতে ব্যাপ দিয়েছিল তারপর আর কিছু মনে নেই। হস হলে দেখেছিল ও এক দল ছেলেদের মাঝে শুয়ে আছে তারা পরম স্নেহে মায়ের মত যত্ন করে ওর সেবা করছে।

এক সাগর রক্ত আর ত্যাগ তিতিকার বিনিময়ে এলো স্বাধীনতা ধ্বংসের পর সৃষ্টি। যে যার ঘরে ফিরেছে প্রিয় জনের কাছে এক সময় শাহেদও ফিরে এসেছিলো বাড়ীতে কিন্তু সেখানে ওর জন্য অপেক্ষা করার কেউ ছিল না। পাশ গায়ে স্বস্তির বাড়ীতে গিয়ে পৌছে ছিল সন্ধ্যাবেলা একজন মৃত্তিযোদ্ধার ঘাড়ে ভর করে।

কুমু এতো সুন্দর তা আগে শাহেদের চোখে তেমন পড়েনি কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে এক পা কাটা খোঁচা খোঁচা দাড়ি শুদ্ধ একটা কক্কালসার স্বামীকে পেয়ে কুমুর মতো সুন্দরী মেয়ে কতনা কেদেছে সে রাত্রে ওরা ২ জন একটুও ঘুমায়নি। শুধু ন'টি মাসের জমানো আবোল তাবোল কথা শুনিয়েছে চোখের জলের মাঝে। শাহেদ ভেবেছিল কুমু হয়তো তাকে ঘৃণা করবে, ফিরিয়ে দেবে কিন্তু না কুমুর বুকের ভালবাসা স্নেহময়ী মমতা দিয়ে শাহেদকে সুন্দর প্রতিষ্ঠিত জীবনে ফিরিয়ে এনেছিল কুমু।

অবার ভাঙ্গা ঘরে সখের আলো দেখতে পারা শাহেন তাদের জীবনে আসে নোতুন অতিথি মুমু। এবার তেরোর পা দিয়েছে মুমু। বহরগুলো ডিঙ্গিয়ে দেখতে দেখতে মোটেটা বরষের তুলনায় বেশ বেড়ে উঠেছে। ওর বাড়ন্ত শরীরের দিকে চেয়ে নিজের অসহায় গল্পটো যেমনো দারুণ কষ্ট দেয় আজকাল শাহেনকে।

এতক্ষনে ওর চিন্তার জাল হিড়ে যয়। বেশ কয়েকজন লোক কি একটা ধরাধরি করে বয়ে আনছে। আবহা আজকারে চিণা গলিটার ঠিক বুয়ে উঠতে পারে না শাহেন। লোকগুলো ঠিক তারই যারামার উঠে আসে এবং কাকে যেন শুইয়ে দেয়। এ কি? এ যে তার কুমু। রক্তাক্ত খেঁলানো দেহটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে শাহেন। কে একজন বলেঃ ভদ্র মহিলা রিক্সায় আসছিলাম ট্রাক ওটার টেক করার খাজা খেয়ে রিক্সা থেকে উনি হিটকে পড়েন তারপর সব শেষ। আমরা কাহাকাহি হিলাম রাস্তার পাশে। ওনার ব্যাগে এ বাড়ীর ঠিকানা ছিল তাই নিয়ে এসেছি। ভুল করিনি তো! শাহেনের মুখে কোন জবাব নেই। একটা পাচা ঘরের চালে বসে বিশ্রী স্বরে ডাকে। মুমু আজকার ঘরে কাতরাচ্ছেঃ “মা—মাগো পানী—একটু পানী দাও।” সবকিছুই শাহেনের কানে অসহ্যে কিন্তু শাহেন জড় পদার্থের মতো বোবা দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে নিষ্পাপ কুমুর দেহটার দিকে গজার কাছে কাটা ওমরে আসে। হায়রে স্বাধীনতা জাহকে কেড়ে নিলি, বাবা-মাকে নিলি, নিজেকে গল্প করে দিলি যিনিময়ে কি দিলি একমাত্র সমস্ত কুমু একমাত্র বাঁচার পথ কুমুকেও কেড়ে নিলি? হঠাৎ উঠে এসে সে কুমুর দেহটাকে আকরে ধরে তুকের কোঁদে ওঠেঃ কুমু কি বলে চলে গেলে? আমি গল্প সারা পৃথিবী যে আমার মিথ্যা হয়ে গেলো।

— ০ —

প্রসংগ : একুশের গান

তৈয়বা ফিরোজ

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী’—একটি অমর সংগীতের প্রথম কলি। প্রতি বছর একুশের ভোরে নগ্ন পদ যাত্রার প্রভাত ফেরীতে শহীদবেদীমূলে পুষ্পার্ঘ্য অর্পনে মানুষের কর্ত্তে ধ্বনিত হয় এই প্রিয় গান। লাথো কোটি বাঙালীর হৃদয়ের আতি ভালবাসা সব বাঙময় হয়ে ওঠে। এ গানে যেন কথা কয় ‘বরকত, সালাম, রফিকের’ উত্তরসুরিরা, নতুন প্রজন্মের উত্তরাধিকারীরা।

পাকিস্তানী আমলে প্রভাত ফেরীতে হারমোনিয়াম কাঁধে চাদর দিয়ে বেঁধে একুশের এই অমর গান ধ্বনিত হত শিল্পীদের কর্ত্তে। আজ যুগের প্রয়োজনে নানাভাবে নানা পদ্ধতিতে এ গান গায় ভাষাপ্রেমী নারী, পুরুষ, যুব, বৃদ্ধ সকলে। গানের ডিস্ক বেরিয়েছে এখন। তবু একুশের অনুষ্ঠান-মালা এই গান ছাড়া অপূর্ণ। একুশে ফেব্রুয়ারীর স্মৃতিতে কবিতা, গান কম লেখেননি আমাদের শিল্পীরা। কিন্তু এ গানের কোন বিকল্প নেই—হতে পারে না।

এই অমর গানটির রচয়িতা আব্দুল গফফার চৌধুরী। ডঃ রফিকুল ইসলাম তাঁর ‘ভাষা আন্দোলন’-এ শহীদ মিনার গ্রন্থে লিখেছেন যে, আব্দুল গফফার চৌধুরী এটি কবিতা হিসেবে লিখেছিলেন যা আরুতি করা হয়েছিল গেশোরিয়ার ধূপখোলার মাঠে যুবলীগের এক উন্মুক্ত অনুষ্ঠানে। যুবলীগের তৎকালীন সাংস্কৃতিক সম্পাদক সৈয়দ আহমদ হোসেনের কাছ থেকে অনুষ্ঠান শেষে রফিকুল ইসলাম কবিতাটি নিয়ে নেন। এবং আব্দুল লতিফকে সুর করতে দেন। আব্দুল লতিফের সুরে এই কবিতা প্রথম গান হয়ে ওঠে আতিকুল ইসলামের কর্ত্তে। ‘৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ

দিবসে ঢাকা কলেজের অনুষ্ঠানে ঐ গান গেয়ে এবং ঢাকা কলেজ প্রাংগনে শহীদ মিনার তুলতে গিয়ে তাঁরা কয়েকজন কলেজ হতে বহিষ্কার হন। পরে আলতাফ মাহমুদ গানটি আব্দুল লতিফের কাছ থেকে শিখে নেন এবং আরো পরে নতুন করে সুর তুলেন। এখন আলতাফ মাহমুদের সুরেই গানটি গাওয়া হয়।

১৯৮৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সচিত্র স্বদেশ সাপ্তাহিকে এই গানের পূর্ব মুদ্রণ করে এই গানের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের রক্তাতো দিনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বেডে শায়িত বুলেট বিদ্ধ জনৈক তরুণের শিয়রে বসে কবিতাটি রচনা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক আব্দুল গফফার চৌধুরী। তিনি তখন ঢাকা কলেজের ইন্টারমিডিয়েট দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। পরে কবিতাটির অংশ বিশেষ শহীদ শিল্পী আলতাফ মাহমুদের সুরে একুশের অমর সংগীত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বাঙালীর মুখে মুখে। আর এ গানের অমর শিল্পী আলতাফ মাহমুদকে তাই জীবন দিতে হয়েছিল একাত্তরের যাতকদের হাতে।

ভাষা আন্দোলনের রক্ত বারা মানেই এই অমর গানের সৃষ্টি। বাঙালীর ইতিহাসের সংগে এ গানের সম্পর্ক। বাংলা ভাষা ও প্রিয় স্বদেশের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, এ গান ততদিন অমর হয়ে রইবে লাখ কোটি বাঙালীর হৃদয়ে।

একুশ বাঙালী চেতনার প্রতীক

অধ্যাপিকা ওয়াহিদা ইসলাম

অমর একুশ, গণমানুষের চেতনায় স্পন্দিত, আত্মত্যাগের ঐতিহ্যে বলিয়ান, বাঙালী জাতি সত্তার ইতিহাসে সমৃদ্ধ রক্তে রাঙা দিন। মহাকালের পরিক্রমায় অতি সামান্য সময়, কিন্তু বাঙালী পরিচয়ের এই শ্রাশ্রুত সত্যটি বাঙালী চেতনাকে দীপ্ত করে। ফাশুনের পলাশ ফোটা একুশের সেই দিনে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারের রক্ত আমাদের পরিচয়কে চিহ্নিত করে। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য আমাদের জাতীয় জীবনে এনে দেয় নজিরবিহীন বীরের পরিচিতি। অমর একুশ, আমাদের জাতির সকল শক্তির অফুরান উৎস। একুশের পথ ধরেই আসে চুয়াঙ্গ সালের নির্বাচনে বাঙালীর সাফল্য, বাঙালীত্বের বিজয়। ছয়দফার জনগণের ম্যাণ্ডেট, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর স্বাধীনতা। এরকম বহু বৈচিত্রময় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই তো এদেশের মানুষের অগ্রযাত্রা। তাই বিশ্বের মাগচিত্রে বাংলাদেশের অস্তিত্ব মতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন অশ্লান হয়ে থাকবে একুশের মহিমা ও আদর্শ।

কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায় আমরা প্রতিবছর প্রাণের আবেগ নিয়ে একুশ উদ্‌যাপন করি, শহীদদের স্মৃতি তর্পন করি কিন্তু, যারা ভাষা থেকে শুরু করে সব আন্দোলনেই বিরাট অবদান রেখেছিল, সেই সমস্ত সাধারণ বিত্তহীনদের জীবনে একুশ তেমন স্পন্দন তোলে কি? আমাদের

লেখা গল্প, কবিতা যদি দেশের বেশীরভাগ মানুষ কর্তৃক অপাঠিত থেকে যায় তবে আমাদের সংস্কৃতির পূর্নজাগরণ ও পুনর্বিদ্যাস অর্থবহ হবে কি করে? মুষ্টিমেয় পাঠক ও সমালোচকের প্রশংসা ও নিন্দে কুড়ানো-ছাড়া এ সব সাহিত্য দ্বারা মহৎ কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হবেনা। তাই চিন্তায়, কর্মে, আচরণে জীবনের সুন্দর ও শোভন অভিব্যক্তিই যদি সংস্কৃতি হয় তাহলে আমাদের সংস্কৃতিকে সেমিনার ও কবিতার আসরে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বস্তরের মানুষের চিন্তায় ও কর্মে সংযুক্ত করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে সচেতনতা। দুনিয়াতে মায়ের বিকল্প কিছু নেই এ কথা যারা মেনে নিতে পারবেন বোধকরি মায়ের মুখের ভাষাটাকেও তারা ঠিক সেভাবে মূল্যায়ন করতে শিখবেন। তবেইতো গড়ে উঠবে মাতৃভাষার জ্ঞানানুশীলন, সৃষ্টিশীলতা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

অর্থবহ স্বাধীনতা ও আমরা

মলয়া ভট্টাচার্য্য

সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের সাধিক কামনা একটি অর্থবহ জীবনবোধে উজ্জীবিত হ'য়ে একটি সচ্ছন্দ গতিময় সমাজজীবন গড়ে তোলা। কালানুক্রমিক ও বংশানুক্রমিক একটি ঐতিহ্য লালিত সমাজ জীবনে সামিল হতে পারলে ইতিহাস তার ঐতিহ্যের আলো হ'য়ে উঠতে পারে, জীবন পেতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ—যা চলমান বর্তমানকে গৌরবমণ্ডিত অতীতে লীন করে মহিমাম্বিত ভবিষ্যতকে স্বাগত জানাতে পারে। জীবন শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়, শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখের সংগ্রাম নয়, সমাজ জীবন সত্যিকার এবং সাধিক অর্থেই একটি স্বর্ণপ্রসূ অনন্ত প্রবাহ যার ব্যাপ্তি দেশ ও কালের পথ বেয়ে সরল রৈখিকতায় কোনো তাৎক্ষনিক প্রাপ্তির বাসনায় এর গতিরুদ্ধ হয় না, কোনো গৌজামিল এর চলমান প্রবাহে উজান স্রোতের সঞ্চার করতে পারে না।

একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসাবে বার বার নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে কল্পনাবিলাস এবং অন্তসার শূন্য বাগাড়া-ঘরের মাণ্ডল দিয়ে চলেছি আমরা ইতিহাসকে অস্বীকার করে, ইতিহাস সৃষ্টির অলীক স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে, ভ্রান্তিবিলাসে নিমগ্ন করতে চাই জাতিকে। তাই স্বাধীনতার সুফল আমাদের তৃষিত প্রাণে মায়া মরীচিকা হয়ে দেখা দেয়—হিসাব মিলাতে বসে বার বার দেখি প্রাপ্তির ঘরে শূন্য। সকলই ফক্কিয়ার।

“অন্নপায়ী বজ্রবাণী স্তন্যপায়ী জীব
জনদশেকে জটলা করি তপোষে বসে”

কবির এই শ্লেষবাণীর স্বার্থক রূপায়ন ঘটিয়ে আমরা প্রত্যেকেই এক একটি বৈঠকী জীব, আসর জমানো বক্তা মাত্র, এর বাইরে আমাদের আর সকল পরিচয়কেই অস্বীকার করে—সকলেই দেশ-জাতির উদ্ধারে একনিষ্ঠ একব্রতী—শুধু ভুলে বসে থাকতে চাই সমাজ জীবনের ব্যাপক অঙ্গে আমরা সকলেই এক একটি অপরিহার্য প্রত্যঙ্গ আমরা কেউ ক্ষেত্রে চাষী, কারখানায় শ্রমিক, বিদ্যালয়ে ছাত্র বা শিক্ষক দপ্তরে মসীজীবী, ঘরে গৃহিনী, জননী, কন্যা, আপন আপন কর্মক্ষেত্রে সকলের সৃষ্টি বিকাশই আমাদের গোটা সমাজ জীবনের সৃষ্টি বিকাশের অপরি-
হার্য পূর্বশর্ত। একটি বিশাল মহীরুহের মূলের রসগ্রহণ, কাণ্ডের ঋজুতা পাতার সংশ্লেষণ সব মিলিয়েই তার পুষ্পের যথার্থ বিকাশ এবং ফলের পরিপূর্ণতা সম্ভব, এই বাস্তবতা অনস্বীকার্য।

আপন আপন কর্মক্ষেত্রে একনিষ্ঠ স্বচন্দ্র বিচরণে অনাগ্রহ আমাদের সমাজজীবনে আনে চরম ভারসাম্যহীনতা—আপাদমস্তক যে দেহ তার প্রতি অঙ্গের তিন্ন তিন্ন কর্মকাণ্ডে সচল আমাদের দেহযন্ত্র। কিন্তু জাতীয়জীবনের বিশাল দেহযন্ত্রে তিন্ন তিন্ন প্রত্যঙ্গের যথাযোগ্য কর্ম-
কাণ্ডকে নিশ্চিত না করে সকলেই এক আড়ম্বাজ তুলি তাতে প্রাণভেদী আতঁচীৎকার ওঠে বটে কিন্তু সুরের সিংফনী তথা ঐকতানের স্থিতি হয় না—তাইতো “আমার নয়ন আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ।”

বিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে বিশ্ব যখন জ্ঞানগরিমাদীপ্ত অধিকতর বিজ্ঞান সুষমামণ্ডিত একবিংশ শতাব্দীর আগমনী গাইছে তখনই আমাদের বিকট আতঁচীৎকারে গগন ফাটাতে হয় খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই

বাঁচার মত বাঁচতে চাই—আমার শিশুকে বাঁচাতে দাও, আশ্রয় দাও, কিন্তু কেন এই অল্পভেদী চীৎকার—শোষন মুক্তির আহ্বান? শ্রেণী যদি পৃথিবীতে দুটি হয় শোষক ও শোষিত তবে—জাতি হিসাবে কেন আমরা শোষক না হ'য়ে শোষিত হলাম? শক্তি যদি দুটি ছিল তবে আমরা কেন উপনিবেশিক না হয়ে উপনিবেশ হিলাম? অতিনিবেশ সহকারে কি এই আত্মজিজ্ঞাসায় আমরা ভাস্বর হ'য়ে উঠতে পারি না বিশ্লেষণের চাবুক হেনে বিবেকের কাছে কি প্রশ্ন রাখতে পারি না—যে বংশানুক্রমিক ভাবে কালানুক্রমিক ভাবে—একটি জাতি হিসাবে আমরা কি আমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেছি কিংবা করছি কিংবা ভবিষ্যতে করবার প্রস্তুতি নিয়েছি?

সকল প্রশ্নের উত্তরই যদি না হয় তবে ব্যর্থহীনভাবে—আমাদের ব্যর্থতা আমাদের স্বীকার করতে হ'বে—পদ্মা মেঘনা দিয়ে ইতি মধ্যে বয়ে যাওয়া জল উজান স্রোত বয়ে আর ফিরে আসবে না—কোন রাজনৈতিক পট পরিবর্তন আমাদের জন্যে আর সেনার চামচ বয়ে নিয়ে আসবে না। আমাদের ঐকান্তিক কন্ট্রোল আপন অঙ্গনে আপনাতে আপনি ভাস্বর হ'য়ে উঠার মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যত নিহিত রয়েছে। “এ পৃথিবীর লেশতম স্থান” বা “ব্যর্থতম প্রাণ ও দুর্লভ” এই দুর্লভ প্রাণকে সত্যিকার অর্থে প্রাণশক্তিতে ভরপুর করে বিকশিত হওয়ার সংগ্রামে সামিল হ'তে হ'বে। মেরুদণ্ডহীন বাতাতাড়িত একটি লতাও অলোকপিয়াসী সূর্যমুখী আর আমরা বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা সমন্বিত মানব-মানবী, অমৃতের সন্তান, সৃষ্টির সেরাজীব, আমরা কি পারি কর্মক্ষেত্রে পরাধীন হয়ে জীবনকে শুধু শ্লেগানের কন্ঠ করে তুলতে, শুধু দাবীর মিছিলে সামিল হতে?

কর্মময় জীবন—আপন অঙ্গনে পরিপূর্ণ বিকাশ ফাঁকিহীন কম্পাদীপনা ও কর্মোদ্যোগ, সকল স্বাধীনতা, সকল পরিবর্তন, সকল

উন্নত সমাজ গঠনের সফল প্রয়াসের পূর্বশর্ত । কর্মশক্তি উদ্দীপ্ত হ'লে সকল অশুভ শক্তি পশ্চাদ—অপসারণে ব্যতিব্যস্ত হ'বে, সকল দাবী পূরণ হ'বে সকল প্রত্যাশা সফল হবে—নইলে কৃত্রিম পনো গানের পশরা ব্যর্থ হতে বাধ্য ।

দূর কিংবা নিকট অতীতে তিত্ততায় ভরা মন নিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক মুক্তি, শ্রেণী বৈষম্য-হীনতা এবং নিরঙ্কুশ সামাজিক মঙ্গল আনতে অক্ষম । বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের অভিশাপ, ভণ্ডামী এবং প্রতারনার বানীতে আশ্বস্ত করার প্রবণতা জাতীয় জীবনকে মোহগ্রস্ত করার মত কল্পনা-বিলাসী সুখ স্বপ্নের ঘোর সৃষ্টি করা এ সকলই আকস্মিক রাজনৈতিক মুক্তির নঞর্থক উপজাত ।

ন্যস্ত দায়িত্ব নির্ভার সাথে ব্যাষ্টিক ক্ষেত্রে পালিত হ'লে বরং সমষ্টি-গত উন্নতি আশা করা যেতে পারে । আলাদীনের যাদুর প্রদীপ নিয়ে কেউই ক্ষমতারোহী হয় না—পক্ষান্তরে—যাদুর চেরাগের কাহিনী দিয়ে পিতামহী যেমন অবাধ্য অবোধ নাটিকে ঘুম পড়ান তেমনি হয়তো বা কেউ তেমন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হ'তে পারেন । বারুদের ভিতরে অদৃশ্য আগুনের অবস্থান—জলে—বাতাসে রোদ্রে অদৃশ্য ভাবে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রয়েছে সকল শক্তির উৎস । তেমনি মানব অন্তরে মানব শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে সুপ্ত । তার উদ্বোধন ঘটাতে হরে আপন সদিচ্ছার আলোকবতিকা জ্বালিয়ে তবেই ঘটবে সকল প্রত্যাশার পূরণ, সকল স্বাধীনতার বাস্তব রূপায়ন সকল প্রচেষ্টার স্বতস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাজা না

একশে ফেব্রুয়ারী

আমি কি ভুলিতে পারি ?

গ্লোব জুট ট্রেডাস' লিঃ

কাঁচা পাট রপ্তানীকারক

দৌলতপুর, খুলনা।

ফোন : ৬২৯১১, ৬০৬৪৩, ৬০৫২৩

অমর হোক মহান একশে

সানষ্টার (বাংলাদেশ) লিঃ

পাট রপ্তানীতে এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

দৌলতপুর, খুলনা।

ফোন : } বাসা : ৬১৮৭০
 } অফিস : ৬২৩৪১
 } ঢাকা অফিস : ৪০৩৯১৫

একুশের আলোকে
সোনার বাংলাকে সাজাতে হবে—

খান ব্রাদার্স লিঃ

জুট বেলাস' এণ্ড শিপাস'
দৌলতপুর, খুলনা।
ফোন : ৬২৩৯২, ৬২১০৪

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের
জানাই লাখে সালাম

ফারুক হোসেন এণ্ড কোং

কাঁচা পাট রপ্তানীকারক
দৌলতপুর, খুলনা।

ফোন : $\left. \begin{array}{l} ২১৬৪৫ \\ ৬০৭৪০ \\ ৬২১৭১ \end{array} \right\}$

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলা ভাষা আনলো যারা
আমরা তোমাদের ডুলবোনা ।

খুলনা মহিলা সমিতি ।

নিবন্ধন নম্বর ১১৪৮/৬৩

৩৭, খানজাহান আলী সড়ক, খুলনা ।

অমর একুশে
দীপ্ত শগথ
এগিয়ে চলছে।



ওহাব জুট ট্রেডিং কোং লিঃ

জুট বেলাস' এণ্ড শিপাস'

দৌলতপুর, খুলনা।

ফোন : ৬২৫৭৮, ৬০১৫১

মুদ্রণ : কথাকলি প্রিন্টার্স, খুলনা। ফোন : ২০৮৮৮